যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতন
ঢাকা মহানগরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর একটি সমীক্ষা

মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে গত কয়েক বছরে ইভটিজিং তথা যৌন হয়রানি একটি সামাজিক ব্যাধি বা অসুস্থতা হিসেবে দেখা দেয়, যা একটি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়। অতীতেও এ সমস্যাটি ছিল, তবে সম্প্রতি এটি বেড়ে গেছে বলে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ধারণা করা যায়। এর ফলে নারীসমাজসহ গোটা সমাজে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করতে থাকে। বাড়ির বউ-ঝিদের বাইরে পাঠিয়ে অভিভাবকরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারছিলেন না। সবসময় এক অজানা আতঙ্ক তাদের তাড়া করে ফিরছিল। এ অবস্থা একটা মাত্রায় এখনো বিরাজ করছে, নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে যে সমস্যা দূরীভূত হওয়া অতীব জরুরি।

দেখা যায়, সাধারণত স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া মেয়েরাই যৌন হয়রানির বেশি শিকার হয়। তবে তরুণীদের পাশাপাশি অনেক কর্মজীবী নারীও এর শিকার হচ্ছেন। এর ফলে অনেক মেয়েশিক্ষার্থী লেখাপড়া এবং অনেক কর্মজীবী নারী কর্ম ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এদিকে বাংলাদেশে নির্যাতনের শিকার সবচেয়ে বেশি হচ্ছেন গৃহশ্রমিক এবং গৃহবধূরা, যার প্রভাব আমাদের দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

হয়রানির মানসিকতা সৃষ্টি বা এর উৎপত্তি সম্পর্কে প্রায় সকলেই পারিবারিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা ও পরিবেশকেই দায়ী করছেন। এসব সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজন আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মনমানসিকতার পরিবর্তন, নারীদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব তৈরিতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের বিশেষ ভূমিকা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ। এহেন পরিস্থিতিতে যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতনের মতো এমন মারাত্মক সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে এর কুফল সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক বলে মনে হয়।

দেখা যায়, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী মেয়ে ও কর্মজীবী নারীরা প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, এমনকি নিজবাড়ির চৌহদ্দির ভেতরেও নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এ কারণে অনেকে জীবনযাপনের স্বাভাবিক রুটিন পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছেন। মেয়েশিশুদের অনেকে নিরাপত্তাহীনতার কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঘরবন্দি জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে কেউ কেউ নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছে। কাজেই যৌন হয়রানি কোনো হালকা রসিকতার বিষয় নয়, বরং এটি একটি গুরুতর সামাজিক অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন। যে কারণে হাইকোর্ট এক রায়ে ইভটিজিংকে যৌন হয়রানি হিসেবে গণ্য করে একে আইনের অন্তর্ভুক্ত করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

যৌন হয়রানির কারণ যা-ই হোক না কেন, তা কখনোই ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর নয়। যৌন হয়রানির যেসব কারণ চিহ্নিত করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং নারীকে পণ্য ও ভোগ্যবস্তু মনে করার প্রবণতা। বিষয়টি 'ইভ টিজিং' বা উত্ত্যক্তকরণ হিসেবে সর্বপ্রথম আলোচনায় আসে ১৪১৭ সালের

পহেলা বৈশাখ বর্ষবরণ উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে নারীলাঞ্ছনার ঘটনা থেকে। পরে একইরকম ও এর চেয়ে ভয়াবহ মাত্রায় এরকম ঘটনা দেশব্যাপী ঘটতে শুরু করে এবং জাতীয়ভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। কারণ শুরুতে সীমিত পর্যায়ে থাকলেও পরবর্তী সময়ে এটি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যৌন হয়রানির কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা এ গবেষণার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে চারটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে—

১. যৌন হয়রানি কারণ, ধরন, যৌন হয়রানি কারা করে, কোন কোন বিষয় যৌন হয়রানিকে উৎসাহিত করে এবং কারা যৌন হয়রানির শিকার হয়, সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া;
২. গবেষণা এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেয়েশিক্ষার্থীদের ওপর হওয়া যৌন হয়রানির চিত্র তুলে ধরা;
৩. যৌন হয়রানির ক্ষতিকর প্রভাব চিহ্নিত করা;
৪. যৌন হয়রানি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ করা।

তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় যে সব তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার অধিকাংশই প্রাথমিক (প্রাইমারি) পর্যায়ের উৎস থেকে আহৃত, যার সাথে দ্বিতীয় (সেকেন্ডারি) পর্যায়ের উপাত্তসমূহও সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য ঢাকা মহানগর থেকে দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতিতে ৩০টি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০ জন মেয়েশিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ৫ জন শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে প্রশ্নমালা তৈরি ও পাইলট সার্ভে করা হয়। যার সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন সম্পূরক প্রশ্নের মাধ্যমে গবেষণাকে আরো যুক্তিযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য-উপাত্তের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত তথ্য, প্রতিবেদন প্রভৃতির সাহায্য নেয়াসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গবেষণাকর্ম ও লাইব্রেরির সাহায্য নেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের পর তা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কোডিং করে কম্পিউটারে সেগুলোর এন্ট্রি করা হয়। এন্ট্রি করার ক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক মানগুলোকে অপরিবর্তিত রেখে গুণবাচক মানগুলোকে সংখ্যায় পরিবর্তন করে নেয়া হয়। ডাটা-এন্ট্রির পর SPSS (Statistical Package for Social Sciences) এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উপাত্তসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সমীক্ষা এলাকা

প্রাচীন বাংলার রাজধানী হিসেবে গৌড়, পান্ডুয়া, সোনারগাঁও ও রাজমহলের পরেই ঢাকার স্থান। সুবে বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকা মুর্শিদাবাদ ও কোলকাতার চেয়েও প্রাচীনতম। রাজধানী হিসেবে ঢাকা ১৬০৮ সালে, মতান্তরে ১৬১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৬ সালে ঢাকা শহরের মোট

জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ লক্ষ, যা ২০০০ সালে এসে ৯৯ লক্ষে উন্নীত হয় (BBS, 2003)। এর আয়তন ৬২ বর্গমাইল (Khoda, 2005)। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে গবেষণা এলাকা বাংলাদেশের প্রায় মাঝামাঝি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এর দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, পশ্চিমে তুরাগ, পূর্বে বালু এবং উত্তরে টঙ্গী খাল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। গবেষণার জন্য ঢাকাকে নির্বাচন করার কারণ হচ্ছে— ঢাকায় সরকারি ও বেসরকারি ৮২টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩২টি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। এছাড়া ঢাকায় ১০০০-এর বেশি স্কুল (কিন্টারগার্টেন থেকে হাইস্কুল), মাদ্রাসা ও কলেজ রয়েছে (Islam, 2008)। এছাড়াও ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী শহর এবং দেশের প্রধান ও জনবহুল নগর।

গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞায়ন

নারী

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারী বলতে কন্যা, জায়া, জননী এ তিনটি রূপকে বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য গবেষণা নারী বলতে ১২ বছর থেকে ২৫ বছর বয়সী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মেয়েশিক্ষার্থীকে আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

নির্যাতন

নির্যাতন বলতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হুমকি বা বলপ্রয়োগ করাকে বোঝায়। মূলত নির্যাতন হলো শারীরিক, মানসিক চাপ প্রয়োগ করে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক ব্যবস্থা। নির্যাতন হচ্ছে এমন একটি অবস্থা, যা কোনো ব্যক্তিকে এক অসহনীয় পরিস্থিতিতে ফেলে। অর্থাৎ কারো অধিকার খর্ব বা হরণ করা এবং কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বিষয় চাপিয়ে দেয়া বা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছানুসারে কাজ করাও নির্যাতন।

নারী নির্যাতন

নারী নির্যাতন বলতে নারীদের ওপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যেকোনো ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনকে বোঝায়। আরো সহজ করে বললে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নারীরা যখন অন্যের দ্বারা জোরপূর্বক বঞ্চনার সম্মুখীন হয় এবং শারীরিক, যৌন ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সে পরিস্থিতিকে নারী নির্যাতন বলে। নারীর যেকোনো অধিকার খর্ব বা হরণ করা এবং কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বিষয় চাপিয়ে দেয়া বা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছানুসারে কাজ করতে বাধ্য করাও নারী নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত।

যৌন হয়রানি বা ইভ টিজিং

ইভ টিজিংয়ের শাব্দিক অর্থ উত্ত্যক্ত করা। এটি নারী নির্যাতনেরই একটি রূপ। মহামান্য হাইকোর্ট ইভ টিজিংকে যৌন হয়রানি হিসেবে পরিগণ্য করতে বলেছেন বলে এই গবেষণায় আমরা গর্হিত ওই আচরণকে বোঝাতে সাধারণত যৌন হয়রানি শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছি, কোথাও কোথাও প্রয়োজনে ইভ টিজিং শব্দটি রাখা হয়েছে। এটি শুধু কোনো নারীর ওপর আক্রমণাত্মক বিশেষ কিছু নয়, বরং নারীর বিরুদ্ধে মানসিক বা শারীরিক কোনো অসদাচরণ করা বা স্বাধীনভাবে তার চলাফেরার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। যৌন হয়রানি হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে বিরাজমান অসম ক্ষমতাসম্পর্কেরই একটি বহিঃপ্রকাশ।

যৌন হয়রানি ও যৌন হয়রানির সংজ্ঞা, যৌন হয়রানির ধরন, কারণ ও স্থান

ইভ টিজিং শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালালেই যৌন হয়রানি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া সম্ভব। বাইবেলে উল্লিখিত 'অ্যাডাম' এবং 'ইভ' থেকেই 'ইভ' শব্দটির সৃষ্টি বলে প্রতীয়মান হয়। বলা হয়ে থাকে, অ্যাডাম অর্থ আদি পুরুষ এবং ইভ অর্থ আদি মানবী বা নারী এবং টিজিং অর্থ উত্ত্যক্তকরণ (হিরা, ২০১০)। সুতরাং বলা যেতে পারে, ইভ টিজিং শব্দের শাব্দিক অর্থ নারীকে উত্ত্যক্তকরণ। অর্থাৎ পুরুষকর্তৃক নারীকে উত্ত্যক্ত করাই হচ্ছে ইভ টিজিং বা যৌন হয়রানি। পুরুষ কর্তৃক নারীকে উত্ত্যক্ত করার বিষয়টি আমাদের সমাজে একটি পুরানো সমস্যা। এটাকে আমরা অনেকদিন থেকে সযত্নে লালন করে এসেছি; যেমন, আমাদের প্রায় চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকার প্রণয়ের পূর্বে পরিচয়সূত্র তৈরি হয় টিজিং-এর মাধ্যমে। তাছাড়া খল অভিনেতা-অভিনেত্রী, কমেডি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়শৈলী প্রশংসিত হয় তারা কত নতুন রূপে, কত নতুন মাত্রায় টিজিং করতে পারে তার ওপর (পশ্চিমা মিডিয়া, বলিউডি চলচ্চিত্র ও অনেক ক্ষেত্রে মিরাক্কেলও এর উদাহরণ হতে পরে)। উল্লসিত দর্শক তা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাস্তবেও সে কৌশল প্রয়োগ করে, যা অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, ঘটে যায় ভয়াবহ অনভিপ্রেত ঘটনা। আমরা জানি, চলচ্চিত্র মানুষকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে এবং পর্দার নায়ক বা নায়িকাকে সাধারণ দর্শক আদর্শ হিসেবে ভাবে। মিডিয়া সংস্কৃতির ধারক ও বাহক আবার অনেক ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্রেরও ধারক ও বাহক। সচেতনতার অভাব হেতুই এগুলো স্বাভাবিকভাবে চলছে এবং সমাজ সেগুলোকে গ্রহণও করছে (সারা, ২০০৭)। তবে আশার কথা, কথিত ইভ টিজিংকে যৌন হয়রানি হিসেবে গণ্য করা ও একে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে দেখার হাইকোর্টের রায়ের বিষয়টি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারিত হওয়ায় এবং কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, বিশেষ করে নারী ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর যৌন হয়রানি বিরোধী কর্মকাণ্ডের কল্যাণে বর্তমানে এটি একটি অপরাধযোগ্য যৌন হয়রানিমূলক আচরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

প্রচলিত অর্থে ইভ টিজিং বলতে নারীদের উদ্দেশ্য করে অশালীন মন্তব্য, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, অশ্লীল ইঙ্গিত, পথ আটকে দাঁড়ানো, ওড়না টেনে ধরার মতো অশোভন আচরণ, অকারণে গায়ে হাত দেয়া, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক বাক্য ছুড়ে দেয়া, জনসমক্ষে অপমান করার চেষ্টা করা, মেয়েদের উদ্দেশ্য করে শিস বাজানো, বাজে কথা বলা, কাউকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সুন্দরী বলা, অশোভন ও অশালীন আচরণ করা, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উসকানিমূলক তালি বাজানো, লম্পট চাহনি, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় ব্যাকসাউন্ড করা, চোখ টিপ দেয়া, রিকশা থামিয়ে প্রেমের প্রস্তাব দেয়া, প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না-হলে ভয় দেখানো, জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়া, মেয়েদের টিটকারি দেয়া, বাসে মেয়েদের গা ঘেঁষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা, কাগজে আপত্তিকর কথা লিখে গায়ে ছুড়ে মারা, মোবাইল ফোনে অশ্লীল মেসেজ পাঠানো ও অশ্লীল কথা শুনানো ইত্যাদিকে বোঝানো হয়ে থাকে। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী এর সবই যৌন হয়রানির আওতায় পড়ে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, এখনো আমাদের সমাজে অনেকে এ ধরনের আচরণকে তরুণ বয়সীদের একটু মজা বা দোষ, নিরীহ রোমান্টিকতা, নিছক মজা বা বয়সজনিত চপলতা হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। আবার কেউ কেউ একে খারাপ আচরণ বলতেই নারাজ। ফলে এ ধরনের চরম অন্যায় সরাসরি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য না-হলেও, প্রবলভাবে সমাজের দ্বারা প্রতিকার ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় না। যে যেভাবেই বলুক বা ভাবুক না কেন, এটি শেষ বিচারে যৌন হয়রানি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যা নারীর অধিকার তথা মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে।

যৌন হয়রানিকারীর সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি, যারাই মেয়ে অথবা নারীদের যেকোনোভাবে উত্যক্ত করে তারাই হয়রানিকারী। এদের ধরাবাঁধা কোনো বয়স না-থাকলেও সাধারণভাবে বলা যায়, তরুণ বয়সী ছেলেরাই যৌন হয়রানি বেশি করে। উঠতি বয়সের তরুণ, যুবসমাজ, পাড়ার মাস্তান, নেশাগ্রস্ত বখাটে যুবক, বেকার ও ভবঘুরে যুবক, রাজনৈতিক দলের কর্মী, রাজনৈতিক ক্যাডাররা সাধারণত যৌন হয়রানির সাথে বেশি জড়িত। তবে অনেকে হয়রানিকারী হিসেবে মধ্যবয়সী পুরুষ, দোকানের সেলসম্যান, ফেরিওয়ালা, রিকশাওয়ালা, বাসচালক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথাও বলেছেন। বাস, ট্রাক, ট্যাক্সিচালক, শ্রমজীবী বা চাকুরিজীবী সহকর্মী (বিশেষ করে গার্মেন্টস কর্মী), ফুটপাত ও দোকানদারদের বিরুদ্ধেও যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধারণা হয়, এজন্য মূলত এক ধরনের মানসিক বিকৃতিই দায়ী। এছাড়া অপসংস্কৃতি, অপরাজনীতি, কালো অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার, নারীদের প্রতি অশ্রদ্ধার মানসিকতা প্রভৃতি কারণেই এরা হয়রানির মতো অপরাধমূলক কাজটি করে থাকে।

নারীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উত্যক্তি বা হয়রানির মূল উৎস। তবে নারীর প্রতি সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য ও বঞ্চনা, নারী ও শিশুদের সামাজিকভাবে অবমূল্যায়নের চলমান সংস্কৃতি, পারিবারিক সম্পত্তির অধিকারে নারীর প্রতি বৈষম্য, নারী-পুরুষের পারস্পরিক জৈবিক আকর্ষণ, নারীর প্রতি পুরুষের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, নারীর ক্ষমতায়নের অভাব, যথাযথ আইন না-থাকা, আইন প্রয়োগের শিথিলতা, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক বিচার, মেয়েদের বেপরোয়া চলাফেরা এবং অশালীন ও অমার্জিত পোশাক, আকাশসংস্কৃতির প্রভাব, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার, মানসিক অসুস্থতা ও যৌন বিকারগ্রস্ততা, কামভাব পোষণ করা প্রভৃতিকে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা যৌন হয়রানির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

যৌন হয়রানির ঘটনা সাধারণত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং এসব প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন রাস্তার মোড়, দোকান, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের সামনে, মহিলা হোস্টেল, অফিস, গার্মেন্টসের সামনে, পাবলিক বাস, ট্রেন, লঞ্চের ভিড়, ফুটপাত, বাজার ও মার্কেটের ভিড়ে বেশি হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে যৌন হয়রানির সাম্প্রতিক চালচিত্র

গবেষণায় দেখা গেছে, যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা বর্তমানে বেড়েই চলেছে, যার দ্বারা নারীদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে যে শুভ পরিবর্তন ঘটেছে, তার সিংহভাগ কৃতিত্ব নারীর। বাণিজ্যিক ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। সকল ধরনের কাজের জন্য পুরুষের সমান যোগ্যতা, দক্ষতা ও অবদান থাকা সত্ত্বেও নারীকে খাটো করে দেখার প্রবণতা আজো আমাদের সমাজে রয়ে গেছে।

আইন ও সালিস কেন্দ্রের তথ্য মতে, ২০১০ সালে দেশের পত্র-পত্রিকায় যৌন হয়রানির খবর প্রকাশিত হয়েছে ৬৫৩টি এবং ২০১১ সালের জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে যৌন হয়রানির খবর প্রকাশিত হয়েছে ৪৯৭টি। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১০ সালে মেয়েদের উত্যক্ত করার ঘটনা ঘটেছে ৮০১টি এবং উত্যক্তের কারণে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে ২৭টি। ২০১১ সালের প্রথম ছয় মাসে উত্যক্তকরণের ঘটনা ৫৫২টি এবং এ কারণে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে

১৭টি। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য মতে, গত ২০১১ সালে সারা দেশে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ১০৪১ জন, যার মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন ২৭ জন (প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০১২)। পুলিশের হিসেব অনুযায়ী, জানুয়ারি-নভেম্বর ২০১০ সময়ে যৌন হয়রানির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ৭৩৮টি এবং এ সকল ঘটনায় মামলা হয়েছে ১৯৯টি, জিডি হয়েছে ৫৩৯টি, গ্রেপ্তার হয়েছে ১ হাজার ৩৯৯ জন। অপমানিতবোধ করে আত্মহত্যা করেছেন ২৮ জন, আর প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ জন (দৈনিক আমাদের সময়, ১ জানুয়ারি ২০১১)।

২০১০ সালে যৌতুকজনিত নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছেন ২৪৯ জন, নির্যাতিত হয়েছেন ১২২ জন (সংবাদ, ২ মার্চ ২০১১)। বেসরকারি সংস্থা অধিকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৫-২০১০ মেয়াদে দেশে যৌতুকজনিত নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছেন ১ হাজার ২৫৭ জন নারী, নির্যাতন করা হয়েছে ৩৪৮ জনকে, নির্যাতন সইতে না-পেরে আত্মহত্যা করেছেন ২৪৩ জন (কালের কণ্ঠ, ৮ মার্চ ২০১১)। ১৯৯৯-২০১০ সালে অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন ৩১৩৫ জন, এর মধ্যে শুধু ২০১০ সালে ১৩৫ জন (প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০১১)। এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১১ সালের জানুয়ারি-মে মেয়াদে ৪৯ জন অ্যাসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন (সংবাদ, ২১ জুলাই ২০১১)। ২০০৬-২০১০ পর্যন্ত পারিবারিক নির্যাতনে প্রায় ১৫০০ জন নারী প্রাণ হারিয়েছেন (সংবাদ, ১৮ জুন ২০১১)। বেসরকারি সংস্থা অধিকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৫-২০১০ সময়ে দেশে ১ হাজার ৫৯৮ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার, ১ হাজার ৮৭৬ জন নারী ধর্ষণ এবং ২০১০ সালে ২১৬ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন (কালের কণ্ঠ, ৮ মার্চ ২০১১)। পুলিশ রিপোর্ট ২০১০ অনুযায়ী, সারা দেশে অপহরণের শিকার হয়েছেন ৮৭০ জন (দৈনিক আমার দেশ, ১৩ মার্চ ২০১১)। পুলিশের ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, দেশে প্রতিদিন গড়ে ৩৭ জন নারী ও শিশু নির্যাতিত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে ১০ জন ধর্ষিত হচ্ছে। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বছরগুলোতে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য মতে, ২০১১ সালে সারা দেশে বেআইনি ফতোয়ার শিকার হয়েছেন ৫৮ জন ও যৌতুকের জন্য প্রাণ হারিয়েছেন ৩৩০ জন নারী (প্রথম আলো ৩ জানুয়ারি ২০১২)। এছাড়া অ্যাসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন ৮৩ জন, যাদের মধ্যে মারা গেছেন ২ জন। আগুনে পোড়ানো হয়েছে ৭৩ জনকে, তাদের মধ্যে ৩৮ জন মারা গেছেন (প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০১২)। ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৮৯৬ জন, যার মধ্যে গণধর্ষণের শিকার ১৬৫ জন, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৯৬ জনকে ও ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে ১৪৪ জনকে। এছাড়া আত্মহত্যায় বাধ্য হয়েছেন ২৫ জন নারী (প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০১২)। জানুয়ারি-অক্টোবর ২০১১-এর মধ্যে সারা দেশে বিভিন্ন ঘটনায় ৭৪০ জন নারীকে হত্যা করা হয়েছে (দৈনিক সকালের খবর, ৩০ নভেম্বর ২০১১ ও প্রথম আলো, ৫ ডিসেম্বর ২০১১)। নাগরিক উদ্যোগ-এর তথ্য সেল থেকে জানা যায়, ২০১১ সালে সারা দেশে গৃহপরিচারিকা নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ৮১টি (হত্যা, আত্মহত্যা ও নির্যাতন)। প্রতিবেদনকালে বিভিন্ন কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে এবং রহস্যজনক ও অসুস্থতার কারণে মৃত্যু হয়েছে ২৪ জনের, ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে ও নির্যাতন সইতে না-পেরে পড়ে গিয়ে মারা গেছে ১৮ জন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে ও পুড়িয়ে মারা হয়েছে ৪ জনকে, গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী ও তাদের আত্মীয়দের নির্যাতনে আহত হয়েছে ২৭ জন, গৃহকর্তার অনৈতিক সম্পর্কের ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে ৩ জন, গৃহকর্তা/গৃহকর্ত্রীর আত্মীয়ের হাতে ধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা হয়েছে ৫টি। নির্যাতিতদের মধ্যে ১৬ জনের বয়স ছিল ৯ থেকে ১২, ১১ জনের বয়স ছিল ১৩ থেকে ১৪, ২৫ জনের বয়স ছিল ১৫ থেকে ৫০ এবং ২৯ জনের বয়স জানা যায় নি। এসব ঘটনায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৪টি মামলা ও জিডি (হত্যা, মৃত্যু, অপমৃত্যু ও ধর্ষণ) দায়ের করা হয়েছে। পহেলা জানুয়ারি

২০১১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত সারা দেশে নারী নির্যাতনের চিত্র নারীপক্ষের 'অধিকার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী অ্যাসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন ২৯৭ জন, যৌতুকের কারণে নির্যাতিত হয়েছেন ৪৩ জন, যৌতুকের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন ৬ জন, ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৭২০ জন এবং অন্যান্য কারণে নির্যাতিত ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ১৫০ জন নারী।

যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ

যৌন হয়রানি নির্মূল ও প্রতিরোধকল্পে সাম্প্রতিককালে নেয়া হয়েছে নানা আইনি পদক্ষেপ; যেমন কথিত ইভ টিজিং বন্ধে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনে দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা সংযোজন করা হয় (যা ৯ নভেম্বর ২০১০ থেকে কার্যকর হয়), যেখানে বলা আছে, নারীর সম্ভ্রমহানির অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত কোনো কথা, কাজ, অঙ্গভঙ্গি হচ্ছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ম্যাজিস্ট্রেট এ ধারা প্রয়োগ করে অপরাধীকে ঘটনাস্থলে বিচার করে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬-এর ৭৬ ধারায় বলা আছে, যদি কোনো পুরুষ রাস্তায় জনসমক্ষে কোনো নারীর দৃষ্টির ভেতর, বাড়ির বাইরে বা ভেতরে যেখান থেকেই হোক নিজেকে অশোভনীয়ভাবে প্রদর্শন করে, ইচ্ছাকৃতভাবে রাস্তায় বা জনসমক্ষে নারীকে চাপ বা বাধার সম্মুখীন করে বা অশোভনীয় ভাষায় বা অঙ্গভঙ্গি অথবা মন্তব্য করে তার জন্য সে ব্যক্তি ৯ বছরের কারাদণ্ড অথবা ২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০(২) ধারায় বলা হয়েছিল, কোনো পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌনকামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীর শ্লীলতাহানি করলে বা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করলে তাহার এই কাজ হবে যৌন হয়রানি এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ ৭ বৎসর কিন্তু অন্যূন ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। কিন্তু এ ধারার অপব্যবহার হতে পারে এই আশঙ্কা থেকে ২০০৩ সালে এই আইন সংশোধন করা হয়।

হয়রানিকারীদের দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকায় বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর অভিযোগ দায়েরের জন্য একটি নম্বর (৭৩৭৩) চালু করে। হয়রানি বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ইভ টিজিং প্রতিরোধ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। আইন কমিশন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন ২০১০-এর খসড়া প্রণয়ন করে, যাতে গুরুতর ও লঘু শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কোনো নারী যৌন হয়রানির শিকার হলে কিংবা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে হেল্প লাইনে সরাসরি ফোন করে অভিযোগ করতে এবং আইনি সহায়তা নিতে পারবেন।

এছাড়াও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশে কতগুলো আইন রয়েছে। আইনগুলো হচ্ছে— মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ ও সংশোধনী ১৯৮৬; যৌতুকনিরোধ আইন ১৮৮০ ও সংশোধনী ১৯৮৬; নারী নির্যাতন (নিয়ন্ত্রণমূলক শাস্তি) অধ্যাদেশ ১৯৮৩; পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫; বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯, ১৯৮৪; বিবাহ ও তালাক নিবন্ধিকরণ আইন ১৯৭৪; সন্ত্রাসদমন অর্ডিন্যান্স ১৯৯২; নারী ও শিশু পাচার দমন আইন ১৯৯৩; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ১৯৯৫ ও সংশোধনী ১৯৯৮ (নারী ও শিশু নির্যাতন-দমন আইন ১৯৯৮, চূড়ান্ত বিল)।

ঢাকা শহরে যৌন হয়রানির চালচিত্র

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, কিশোরীরাই যৌন হয়রানির প্রধান শিকার; তবে বিবাহিত, অবিবাহিত নারীরাও নানাভাবে এর শিকার হন। কেউ কেউ বলেন, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া মেয়েরা বেশি যৌন হয়রানির শিকার হয়। তার মানে, বর্তমান সমাজে এর শিকার হচ্ছে সকল পর্যায়ের নারীরাই। বাড়ি, রাস্তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিবহণসহ সর্বত্রই মেয়েরা এর শিকার হয়।

বিকৃত মানসিকতা, বিকৃত আনন্দ লাভ ও ভোগের লালসা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, যথাযথ সামাজিকীকরণের অভাব, ছেলেমেয়েদের মেলামেশার সুযোগের অভাবকে এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অনেকে। অনেকে মনে করেন, পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেদের বেশি প্রাধান্য দেয়ার কারণেই যৌন হয়রানির মতো ঘটনার বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। ক্ষমতার দাপট বা এর অপব্যবহার, দলগত প্রভাব ইত্যাদি কারণেও এটি ঘটে থাকে। নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থেকে সরে এসে আকাশসংস্কৃতির আগ্রাসনের কাছে সমর্পিত হওয়া, অপরাধীদের বিচার না-হওয়া, বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন এবং প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার সম্পর্কে সঠিক ধারণা না-থাকা, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার ইত্যাদি বিষয় নেপথ্যে এ ধরনের ঘটনায় ছেলেদের চালিত করে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, ছেলেদের দ্বারা যৌন হয়রানির ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। অনেক সময় মধ্যবয়সী পুরুষদেরও এটি করতে দেখা যায়। কেউ বলেন, ১৩ থেকে ২৫ বছরের ছেলেরা এটি বেশি করে থাকে; বিশেষ করে যারা গার্মেন্টস, গ্যারেজ ও পরিবহণ সংস্থায় কাজ করে।

যৌন হয়রানির শিকার মেয়ে ও নারীরা আচরণে অস্বাভাবিক হয়ে যায়, নিজেকে অসহায় মনে করে ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

ঢাকা শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেয়েশিক্ষার্থীদের 'ইভ টিজিং' বা যৌন হয়রানি প্রত্যয়টি দ্বারা তারা কী বোঝে এমন প্রশ্ন করা হলে ১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী বাজে মন্তব্য করা, ১৫ শতাংশ মানসিক ও সামাজিক নির্যাতন, ২২ শতাংশ অশ্লীল আচরণ, ৩৮ শতাংশ উত্ত্যক্ত করা, ৩ শতাংশ শাস্তিযোগ্য বা দণ্ডনীয় অপরাধ এবং ৪ শতাংশ মূল্যবোধের অবক্ষয় হিসেবে আখ্যায়িত করে। কখনো এর শিকার হয়েছেন কি না এমন প্রশ্ন করা হলে ৬৮ শতাংশ বলে শিকার হয়েছে এবং বাকি ৩২ শতাংশ কখনো শিকার হয় নি। হয়রানির শিকার ৬৮ শতাংশের মধ্যে ৫ শতাংশ নিজ বাড়িতে, ৫০ শতাংশ রাস্তায়, ৫ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, ৪ শতাংশ গণপরিবহণে, ১৫ শতাংশ ফোনে এবং ২১ শতাংশ বিভিন্নভাবে এর শিকার হয়েছে। হয়রানির শিকার হয়ে তারা কী ধরনের মানসিক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে জানতে চাওয়া হলে ১৯ শতাংশ বলেছে অস্বাভাবিক হয়ে গেছে, ৪৪ শতাংশ নিজেকে হীনম্মন্য/অসহায় মনে করেছে, ১২ শতাংশের শাসন ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে এবং ২৫ শতাংশ নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছে। উত্তরদাতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯১ শতাংশ মনে করে, হয়রানিমূলক আচরণ পূর্বের তুলনায় এখন বেড়েছে। পূর্বের তুলনায় বাড়ার কারণ কী তা জানতে চাওয়া হলে ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বলে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে, ১৩ শতাংশ বলে শাস্তি কার্যকর না হওয়ায়, ৩ শতাংশ বলে অশ্লীল পোশাক পরা/পর্দা না-করার কারণে, ২৩ শতাংশ বলে সামাজিক মূল্যবোধের অভাবে, ১৩ শতাংশ বলে বেকারত্ব ও মাদকাসক্তি বাড়ার কারণে, ১০ শতাংশ বলে অপসংস্কৃতির প্রভাবে, ১৩ শতাংশ বলে আধুনিকতার কারণে যৌন হয়রানি বেড়েছে। গবেষণায় আরো জানা যায়, ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী মধ্যবয়সী ব্যক্তির দ্বারা, ৪৬ শতাংশ বখাটে ছেলের দ্বারা, ৩৭ শতাংশ বেকার ছেলে ও যুবক দ্বারা, ৩ শতাংশ ছেলেশিক্ষার্থী দ্বারা হয়রানির শিকার হয়। এ তথ্য

থেকে দেখা যায়, বখাটে ছেলেদের দ্বারাই বেশিসংখ্যক মেয়েশিক্ষার্থী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। যৌন হয়রানির সাথে মাদকের সম্পর্ক আছে কি না জানতে চাওয়া হলে ৬৭ শতাংশ জানায় যে, সম্পর্ক আছে এবং বাকি ৩৩ শতাংশ জানায় যে, কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। যৌন হয়রানির সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা জানতে চাওয়া হলে ৩৪ শতাংশ জানায়, সম্পর্ক আছে এবং বাকি ৬৬ শতাংশ জানায়, সম্পর্ক নেই। যে ৩৪ শতাংশ জানিয়েছে যে রাজনীতির সাথে যৌন হয়রানির সম্পর্ক আছে, তাদের কাছে কী ধরনের সম্পর্ক আছে জানতে চাইলে ৭২ শতাংশ জানায়, রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার প্রভাব খাটায়, ২০ শতাংশ জানায় রাজনৈতিক নেতারা নৈতিকভাবে মদদ/সমর্থন দেয়, ৮ শতাংশ জানায় রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে না। বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাবকে যৌন হয়রানির সাথে সম্পর্কিত বলে জানিয়েছে। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সমাজে কী কী কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজন আছে তা জানতে চাইলে ৪৫ শতাংশ শিক্ষার্থীই মত দেয় সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে। ১০ শতাংশ বলে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা, ৫ শতাংশ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, ৩২ শতাংশ আইনের যথাযথ প্রয়োগ, ৬ শতাংশ ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং ৩ শতাংশ বলে এর কুফল সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা চালানোর কথা। নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে পারিবারিক পর্যায়ে কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা জানতে চাওয়া হলে ৩৮ শতাংশ সচেতনতা বাড়ানো, ১৯ শতাংশ হয়রানিকারীদের সাবধান করা, ১৩ শতাংশ ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করা, ১৪ শতাংশ শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ৯ শতাংশ অভিভাবকদের দ্বারা বখাটে সন্তানদের শাসন করা এবং ৭ শতাংশ অশালীন পোশাক পরিধান না-করার কথা বলে। নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সরকারের কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে জানতে চাওয়া হলে ৬৩ শতাংশ কঠোরভাবে শাস্তি কার্যকর করার কথা বলে, ১৪ শতাংশ বলে জনগণকে সচেতন করার কথা, ৯ শতাংশ শিক্ষার হার বাড়ানোর কথা, ৫ শতাংশ যৌতুক বন্ধ করার কথা, ৭ শতাংশ মাদকদ্রব্য বর্জন করার কথা এবং ৭ শতাংশ বলে নারীদের নিরাপত্তা দেয়ার কথা।

ঢাকা শহরে নারী নির্যাতনের চালচিত্র

সাধারণ অর্থে নারীর ওপর যেকোনো ধরনের নির্যাতন ও অত্যাচার করাকে নারী নির্যাতন বলে। আরো সহজ করে বললে, নারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করাকে নারী নির্যাতন বলে। তবে বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী নারী নির্যাতন বলতে এমন যেকোনো কাজ বা আচরণকে বোঝায়, যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত করা হয় এবং যা নারীর শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি সাধন করে। এছাড়াও এ ধরনের কোনো ক্ষতি সাধনের হুমকি, জোরপূর্বক অথবা খামখেয়ালীভাবে সমাজ অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণকেও বোঝায়। অর্থাৎ নারী নির্যাতন বা নিগ্রহ বলতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বোঝায়—

১. পরিবারের অভ্যন্তরে শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন, যেমন প্রহার, কন্যাশিশুর ওপর যৌননিগ্রহ, যৌতুকসংক্রান্ত নির্যাতন এবং অন্যান্য প্রথাগত যন্ত্রণাদায়ক রীতি, স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা নির্যাতন এবং নারীকে কোনো কাজে অন্যায়ভাবে ব্যবহারের জন্য নির্যাতন;

২. সমাজের মধ্যে নারীর প্রতি শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন, যেমন ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহ, যৌন হয়রানি এবং কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভীতি প্রদর্শন, অপহরণ ও জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা;

৩. নারীর প্রতি সহিংস আচরণ বা নারী নির্যাতন বলতে সশস্ত্র সংঘাতের সময়ে হত্যা, পরিকল্পিত ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব এবং জোরপূর্বক গর্ভধারণ করাকেও বোঝায় (বেগম, ১৯৯৭)।

গবেষণা এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেয়েশিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতনের চিত্র জানতে গিয়ে দেখা যায়, কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী বিভিন্ন সময়ে তাদের ওপর নির্যাতনের কথা স্বীকার করেছে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এসব শিক্ষার্থীর সকলেই কোনো-না-কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তার কোনোটি প্রকাশ পেয়েছে আবার কোনোটি গোপন রয়েছে। তারা যে ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক, মানসিক নির্যাতনটা যার মধ্যে প্রধান। নির্যাতন করেছে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন। নির্যাতনের কারণ হিসেবে তারা দারিদ্র্য, কুশিক্ষা, শিক্ষার অভাব, জেন্ডার বৈষম্যের সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধের অভাব, যৌতুকের দাবি পূরণ না-হওয়া, স্বামীর নেশাগ্রস্ততা ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অবহেলা কথা বলে। উত্তরদাতা মেয়েরা নারী নির্যাতন বন্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ, জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, যৌতুক বন্ধের ব্যবস্থা করার কথাও বলেন।

ঢাকা শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেয়েশিক্ষার্থীদের নারী নির্যাতন প্রত্যয়টি দ্বারা কী বোঝে তা জিজ্ঞেস করলে ৫২ শতাংশ শিক্ষার্থী নারী নির্যাতনকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। ১৬ শতাংশ অসহায় অবস্থায় ফেলাকে, ১২ শতাংশ নারীদের বিপর্যস্ত করে তোলাকে এবং ২০ শতাংশ নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করাকে নারী নির্যাতন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কখনো নির্যাতনের শিকার হয়েছ কি না? এমন প্রশ্ন করা হলে ৫৬ শতাংশ বলেছে, নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং বাকি ৪৪ শতাংশ জানিয়েছে যে হয় নি। নির্যাতনের শিকার ৫৬ শতাংশের মধ্যে ১৩ শতাংশ শারীরিক নির্যাতন, ৫৯ শতাংশ মানসিক নির্যাতন, ৯ শতাংশ সামাজিক নির্যাতন এবং ১৯ শতাংশ অন্য বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। ঢাকার জরিপকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৮ শতাংশ মেয়েশিক্ষার্থী তাদের বাবা-মা কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়; এছাড়া ২১ শতাংশ আত্মীয়-স্বজন দ্বারা, ১৬ শতাংশ স্বামীর দ্বারা, ১৯ শতাংশ শ্বশুরবাড়ির লোকজন দ্বারা, ৩৮ শতাংশ বাইরের লোক ও পাড়া-প্রতিবেশী দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। উত্তরদাতাদের কাছে নির্যাতনের কারণ জানতে চাইলে তারা বলে, ১১ শতাংশ যৌতুকের দাবি পূরণ না-করার কারণে, ৮ শতাংশ দারিদ্র্যের কারণে, ২ শতাংশ স্বামীর নেশাগ্রস্ততা বা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কারণে, ৭৯ শতাংশ নানাবিধ কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। উত্তরদাতাদের দেখা নারী নির্যাতনের মধ্যে ৩১ শতাংশ নারী স্বামীর দ্বারা, ৪৯ শতাংশ নারী শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দ্বারা, ৯ শতাংশ নারী গৃহশ্রমিক মালিক ও মালিকের পরিবারের লোকজনের দ্বারা, ৫ শতাংশ নারী আত্মীয়, প্রতিবেশী ও বখাটে কর্তৃক ধর্ষিত ও ৬ শতাংশ অ্যাসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে। ঢাকা শহরের জরিপকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭০ শতাংশ মেয়েশিক্ষার্থী নারী নির্যাতন দমন আইন সম্পর্কে জানে এবং ৩০ শতাংশের এ আইন সম্পর্কে কোনো প্রকার ধারণা নেই।

যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতনের পরিণতি বা কুফল

মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা কিংবা যৌন হয়রানির কারণে প্রত্যক্ষ শারীরিক ক্ষতি না-হলেও এর পরিণতি ভয়াবহ হয়ে থাকে। নানাবিধ মানসিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এ ধরনের উৎপাত। হয়রানির শিকার মেয়ে বা নারীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এর কুপ্রভাব পড়ে; এমনকি রাষ্ট্রীয়

পর্যায়েও এর কুফল বর্তায়। নিম্নে যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতনের পরিণতিসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হলো—

ব্যক্তিগত পর্যায়

১. রাস্তাঘাটে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়;
২. স্বতঃস্ফূর্ততা ব্যাহত হয় ও ঘরবন্দি জীবনযাপনে বাধ্য হতে হয়;
৩. স্বাধীনতা খর্ব হয় ও স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয়;
৪. স্বাভাবিক প্রাপ্য অধিকার উপভোগে বাধা আসে;
৫. শিক্ষা অর্জন ও জীবন বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে;
৬. প্রকাশ্যে আক্রান্ত বা অপমানিত হওয়া নিজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে;
৭. সার্বক্ষণিক একটা ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ তাড়া করে ফেরে;
৮. মানসিক চাপ বিপর্যস্ত করে তোলে;
৯. হতাশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগে বা জাগতে পারে।

পারিবারিক পর্যায়

১. অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়;
২. পরিবারের অন্য সদস্যদেরও নিরাপত্তাহীনতার সম্ভাবনা তৈরি হয়;
৩. পরিবারে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়;
৪. কখনো কখনো নিজ বাড়ি বা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হতে হয়;
৫. পড়াশোনা বন্ধ করে দ্রুত মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়া প্রয়োজন বলে বোধ হয়।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়

১. বাল্যবিয়ের হার বেড়ে যায়;
২. স্কুল-কলেজ থেকে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার বেড়ে যায়;
৩. সামগ্রিকভাবে মেয়েদের শিক্ষার হার কমে যায়;
৪. বাল্যবিয়ের সম্ভাব্য পরিণতি হিসেবে কম ওজনের সন্তান প্রসব এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে যায়;
৫. অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মেয়েদের সরাসরি অংশগ্রহণ কমে যায়।

সুপারিশমালা

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র—এই সব কটি পর্যায়ের জন্যই সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতন থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা আবশ্যক। তাহলেই কেবল দেশের অর্ধাংশ জনগোষ্ঠী নারীসমাজের স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ দায়িত্ব ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কারো একার নয়, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই কেবল এ ব্যাধিকে সমাজ থেকে নির্মূল করা সম্ভব। নিম্নে বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা যেতে পারে :

তরুণসমাজ

১. যৌন হয়রানি কোনো মজার বিষয় নয়, এটি একটি জঘন্য ও শাস্তিমূলক অপরাধ। তাই এ ব্যাপারে প্রতিবাদী হতে হবে।
২. নারীর প্রতি সমাজে প্রচলিত বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে;
৩. যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতনের সাথে জড়িতদের মনে রাখতে হবে যে হয়রানি ও নির্যাতনের সংস্কৃতি পরিবর্তন করা না-হলে কখনো নিজের আত্মীয়স্বজনও আক্রান্ত হতে পারে;
৪. সুন্দর সমাজ গড়ে তুলবার কাজে দায়িত্বশীল একজন মানুষ হিসেবে অঙ্গীকার করতে হবে যে, নিজে কখনো যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতন করব না ও অন্যদের করতে দেবো না।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

১. শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানি, যৌন হয়রানির ক্ষতিকর দিক ও শাস্তি বিষয়ে বাধ্যতামূলকভাবে ধারণা দিতে হবে;
২. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে, এ মর্মে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
৩. শিক্ষার্থীদের নিয়ে যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক বেষ্টনী তৈরি করবার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;
৪. কোনো শিক্ষার্থী এ ধরনের কাজে যুক্ত থাকলে তার সাথে আলোচনা করে সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে এ কাজে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবকেরও সহযোগিতা নিতে হবে;
৫. যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতন বিষয়ে মেয়েশিক্ষার্থীদেরও স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।
৬. সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

পরিবার

১. পরিবারে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে;
২. পরিবার থেকেই প্রথমে ছেলেমেয়েদের নারী-পুরুষ বৈষম্যহীনতা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে হবে;
৩. পরিবারকে যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতনমুক্ত রাখতে হবে এবং এর কুফল ও প্রভাব সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের ধারণা দিতে হবে;
৪. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে খোলামেলা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সদস্যদের জন্য সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে;
৫. পরিবারের কেউ হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার হলে তাকে দায়ী না-করে ওই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য তাকে মানসিক সমর্থন দেয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
৬. পরিবারের কেউ হয়রানি বা নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে এর ক্ষতি ও শাস্তি সম্পর্কে জানিয়ে-বুঝিয়ে সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে;

সমাজ

১. সমাজের কোথাও যৌন হয়রানি বা নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে বিষয়টিকে এড়িয়ে না-গিয়ে প্রতিবাদ করা ও প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা-রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করা দরকার;
২. যৌন হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার কোনো মেয়ে বা নারী আইনি সহায়তা পেতে চাইলে তাকে সহায়তা করা দরকার;
৩. যৌন হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার কারো ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়, এমন কোনো মন্তব্য বা আচরণ করা সংগত নয়;
৪. নিজের এলাকা বা পাড়া-মহল্লায় যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলায় ভূমিকা রাখা দরকার;
৫. রাজনীতি ও সামাজিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে হয়রানি ও নির্যাতনকারীরা যাতে পার পেয়ে যেতে না-পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

রাষ্ট্র

১. ইভ টিজিংকে যৌন হয়রানি হিসেবে গণ্য করে দেয়া হাইকোর্টের রায়কে বিবেচনায় নিয়ে সে অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
২. প্রচলিত আইনের সংস্কার করে যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতনের শাস্তি আরো কঠোর করার ব্যবস্থা নিতে হবে;
৩. নারীর প্রতি সাধারণ মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে বৈষম্যমূলক উপাদান পরিহার করে নারী-পুরুষ সমতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে এমন আধেয় যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
৫. রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি মালিকানাধীন গণমাধ্যমে নারী-পুরুষ বৈষম্যহীনতা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার জোরদার করতে হবে এবং নারীকে তাচ্ছিল্যকর ও ভোগ্যবস্তু হিসেবে প্রতিপাদন করে এমন অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপন প্রচার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে;
৬. যৌন হয়রানির ঘটনা বেশি ঘটে এমন স্থানে পুলিশি নজরদারি জোরদার করতে হবে এবং পুলিশসহ আইনশৃংঙ্খলা-রক্ষাকারী বাহিনীকে বাধ্যতামূলক জেন্ডার প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে;
৭. প্রচলিত আইনের বাস্তবায়নে আরো কঠোর হতে হবে ও অর্পিত শাস্তি কার্যকর করতে হবে;
৮. সরকারি উদ্যোগে প্রতিটি থানায় যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ও তার প্রতিকার-বিষয়ক মনিটরিং সেল চালু করতে হবে;
৯. কেউ যাতে হয়রানি ও নির্যাতনকারীকে রক্ষায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা না-নিতে পারে, সেরকম ম্যাকানিজম প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
১০. নির্যাতনের শিকার নারীরা যাতে সহজেই আইনি সহায়তা পেতে পারেন, সেজন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ও তাদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে;

১১. যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতনের শিকারদের বিচার প্রার্থনা ও চিকিৎসা গ্রহণের জন্য সরকারি যে ব্যবস্থাপনাগুলো রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে নানা মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে ও এই সুবিধাগুলো গ্রহণে তাদের অভয়দান ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সমাজ-রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে নারীর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু উদ্বেগের সাথে লক্ষণীয় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতন ঘটনা সংঘটিত হবার হার বেড়ে চলেছে, যা নারীর জন্য বিশেষভাবে সম্মানহানিকর। এর ফলে তারা সাংবিধানিক অধিকার যেমন ভোগ করতে পারছেন না, তেমনি জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। কারণ নারীর স্বাভাবিক চলাফেলা, সম্মানজনক জীবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অন্তরায় যেকোনো বিষয় নারীর ক্ষমতায়নকে বিঘ্নিত করে। সুতরাং কেবল ব্যক্তিনারী বা নারীসমাজের নয়, রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থেই এই নির্যাতনমূলক অবস্থা থেকে নারীদের রক্ষা করতে কালবিলম্ব না-করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন গবেষক ও সংস্কৃতিকর্মী। muhammadjasimuddin@yahoo.com

তথ্যনির্দেশ

১. BBS, 2003. *Bangladesh Population Census, 2001*, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of the people's Republic of Bangladesh.

২. Islam Nazrul, 2008, Dhaka Now: Contemporary Urban Development, Dhaka: Bangladesh Geographical Society.

৩. Khoda, M.M. 2005. *Changing water Bodies of the Dhaka Mertropolitan Area*, Nazem, N.I. (Ed.) Journal of the Bangladesh National Geographical Association, Vol.33, Published By BNGA, Dhaka.

৪. খান, মোহাম্মদ শাহীন ও আখতার তাহমিনা, ২০০৩। নারী নির্যাতন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ৫, ২০০৩, ঢাকা : উইমেন ফর উইমেন।

৫. জামান, সারা, ২০০৭। ইভটিজিং ও সামাজিক বিপর্যয়, নারী ও প্রগতি, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০০৭, ঢাকা : বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

৬. মিয়া, সিদ্দিকুর রহমান, ২০১০। নারী ও শিশু নির্যাতন আইন এবং যৌতুক নিরোধ আইন, ঢাকা : কামরুল বুক হাউস।

৭. রূপা, ফারজানা, ২০১০। যৌন হয়রানি : রিপোর্টারের চোখে, নারী ও প্রগতি, বর্ষ ৬ সংখ্যা ১১, জানুয়ারি-জুন ২০১০, ঢাকা : বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

৮. বেগম, মালেকা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ১৯৯৮, চূড়ান্ত বিল-এর সংশোধনীর প্রস্তাব, ভোরের কাগজ, ৫ এপ্রিল ১৯৯৮।

৯. বেগম, মালেকা (সম্পাদিত), জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন : বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, ঢাকা : রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ১৯৯৭।

১০. শামসুদ্দীন, দারা, ১৯৮৫। *ঢাকার ১৯৫৯ ও ১৯৮০ সালের নগর পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের তুলনামূলক আলোচনা*, ভূগোল পত্রিকা, সাভার : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. হক, জাহানারা, ১৯৯৮। বাংলাদেশে নারী ও শিশু ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতন : একটি সাম্প্রতিক চালচিত্র, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ২, ১৯৯৮, ঢাকা : উইমেন ফর উইমেন।

১২. হিরা, নওশের আলী, ২০১০। নো ইভটিজিং, ঢাকা : নিউ শিখা প্রকাশনী।

১৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ অক্টোবর, ২০১০, পৃষ্ঠা ১১।

১৪. দৈনিক প্রথম আলো, ২ নভেম্বর ২০১০, পৃষ্ঠা ১২।

১৫. দৈনিক আমার দেশ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১০, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩০৬, পৃষ্ঠা ১৬।

১৬. কালের কণ্ঠ, ৮ মার্চ ২০১১

১৭. সংবাদ, ২ মার্চ ২০১১

১৮. দৈনিক আমার দেশ, ১৯ মে ২০১১, পৃষ্ঠা ৮

১৯. সংবাদ, ২১ জুলাই ২০১১

২০. প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০১১

২১. দৈনিক আমাদের সময়, ১ জানুয়ারি ২০১১

২২. প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০১২

২৩. দৈনিক সকালের খবর, ৩০ নভেম্বর ২০১১

২৪. প্রথম আলো, ৫ ডিসেম্বর ২০১১